শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকঃ উপমহাদেশে কোয়ালিশন সরকার, নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক কৌশল

তাসলিমা আক্তার[১]

ইমেইলঃ taslima.pol@cu.ac.bd

Received 31/12/2024 **Accepted** 05/03/2025 **Published** 01/06/2025

সারসংক্ষেপ

ইতিহাসের পট পরিবর্তন এবং সমাজ-রাজনীতির অগ্রগতিতে নেতৃত্বের ভূমিকা অপরিসীম। একজন সুযোগ্য নেতাই পারেন দেশকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে। এরূপ একজন দক্ষ, যোগ্য এবং প্রজ্ঞাবান রাজনৈতিক নেতা হলেন এ. কে. ফজলুল হক। তার দূরদর্শী রাজনীতির প্রতিফলন হলো কোয়ালিশন সরকার। তার সুদক্ষ নেতৃত্বেই ১৯৩৭ সালের বাংলা প্রদেশে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে প্রথম (১৯৩৭-১৯৪১) এবং দ্বিতীয় (১৯৪১-১৯৪৩) কোয়ালিশন সরকার গঠন করা হয়েছিল। যা উপমহাদেশের ইতিহাসে কোয়ালিশন সরকার গঠনে সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতা। এর ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান শাসনামলে ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচনে এ. কে. ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে রাজনীতি জোটের সূত্রপাত হয়। যদিও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রে যুক্তফ্রন্ট বা কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা মাত্র ৫৬ দিন টিকে ছিল। তথাপি, জোটবদ্ধভাবে কাজ করার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা; পরবর্তীতে বাঙালিদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার বিকাশ, স্বাধিকার আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক চেতনা, এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অনুপ্রেরণা হিসেবে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। উপমহাদেশে জোট রাজনীতি প্রবর্তন, কোয়ালিশন সরকার গঠন এবং এর সফল বাস্তবায়নে মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠায় ফজলুল হক তার অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শী নেতৃত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে উপমহাদেশে জোট রাজনীতি ও কোয়ালিশন সরকার গঠনে ফজলুল হকের নেতৃত্ব ও কৌশল এবং এর রাজনৈতিক গুরুত্ব ও প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে মাধ্যমিক উৎস হতে।

সূচক শব্দঃ এ. কে. ফজলুল হক, উপমহাদেশ, জোট রাজনীতি, কোয়ালিশন সরকার (১৯৩৭-১৯৪৩), যুক্তফ্রন্ট (১৯৫৪), রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও কৌশল।

---

[1] সহযোগী অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

ভূমিকা

শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক বাংলা ও সর্বভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে এবং সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের ইতিহাসে একজন কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব (Amanullah, 2017)। বাংলার আপময় কৃষক জনতা ও মেহনতি মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু, শিক্ষানুরাগী, আধুনিক বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের প্রবক্তা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জীবন্ত প্রতীক শেরে বাংলা ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছেন। উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাপ্নিক ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (আহমেদ, ১৯৯৭:২৭৩-২৭৫)। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনেও শেরে বাংলা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তার সাহসী নেতৃত্ব, উদার ও পরোপকারী স্বভাবের জন্য জনগণ তাকে 'শেরে বাংলা বা বাংলার বাঘ' খেতাবে ভূষিত করে। বাংলার কৃষক প্রজা পার্টির এ নেতা কৃষকদের অধিকার আদায়ে সবসময় সোচ্চার ছিলেন। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ফজলুল হক এ অঞ্চলের মানুষের শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন (মাহফুজ, ২০২০)।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ১৯০৪ সালে রাজনৈতিক জীবন শুরু করে দীর্ঘ পাঁচ দশক পর্যন্ত সফল রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ফজলুল হকের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো একটি হলো তার নেতৃত্বে উপমহাদেশে কোয়ালিশন সরকার গঠন। তার সুদক্ষ নেতৃত্বেই ১৯৩৭ সালের বাংলা প্রদেশে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে প্রথম (১৯৩৭-১৯৪১) এবং দ্বিতীয় (১৯৪১-১৯৪৩) কোয়ালিশন সরকার গঠন করা হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান শাসনামলে ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচনে এ. কে. ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে রাজনীতি জোটের সূত্রপাত হয়। যুক্তফ্রন্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা হলেন এ. কে. ফজলুল হক। তাকে কেন্দ্র করেই মূলত '৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট তথা কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছিল (নির্জন, ২০২৩)। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে ১৯৩৭-১৯৪৩ সালের কোয়ালিশন সরকার এবং ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকার তার রাজনৈতিক জীবনের দু'টি মাইলফলক অধ্যায়। এই জোট বা কোয়ালিশন সরকার গঠনের মধ্যদিয়ে তিনি অবিভক্ত বাংলার নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী (১৯৩৭-১৯৪৩) এবং পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর (১৯৫৪) পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এ সময় তিনি বাংলার কৃষক, প্রজা ও শ্রমিক তথা নিম্ন শ্রেণীর অধঃপতিত মানুষের স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করে গেছেন। এছাড়া জোটবদ্ধভাবে কাজ করার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা; পরবর্তীতে বাঙালিদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার বিকাশ, গণতান্ত্রিক চেতনা এবং পরবর্তীতে একক জাতীয় রাষ্ট্র বাংলাদেশ গঠনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন এ. কে. ফজলুল হক (জাহান, ২০২৩)।

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথমত, উপমহাদেশের রাজনীতিতে শেরে বাংলার আবির্ভাব আলোচনা; দ্বিতীয়ত, উপমহাদেশে জোটবদ্ধ রাজনীতি ও কোয়ালিশন সরকার গঠনে শেরে বাংলার নেতৃত্ব ও কৌশল নির্ণয় তথা ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১) ও দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা (১৯৪১-১৯৪৩) উপস্থাপন; তৃতীয়ত, ফজলুল হকের কোয়ালিশন সরকারের মূল্যায়ন; চতুর্থত, পাকিস্তান শাসনামলে রাজনীতিতে শেরে বাংলার প্রত্যাবর্তন; পঞ্চমত, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন এবং এ সরকারের মূল্যায়ন এবং শেষত, উপহাদেশের রাজনীতিতে কোয়ালিশন সরকারের গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ। এ প্রবন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত প্রধাণত মাধ্যমিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের জোট রাজনীতি ও কোয়ালিশন সরকার সম্পর্কিত বিষয়ের উপর প্রকাশিত বই, জার্নাল, থিথিস, গবেষণাপত্র,

সাময়িকী, ইন্টারনেট এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন ও প্রকাশিত রচনাবলির তথ্যাবলি বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণাটি বিভিন্ন পদ্ধতি তথা ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক এবং ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতির সাহায্যে সম্পন্ন হয়েছে।

উপমহাদেশের রাজনীতিতে শেরে বাংলার আবির্ভাব

শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর বরিশাল জেলার সাতুরিয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অভিজাত্য এবং কৌলিন্যের গৌরবে তিনি ছিলেন সিক্ত। ভারতের সুবিখ্যাত সম্রাট শের শাহ ছিলেন তার পূর্ব পুরুষ। ফজলুল হক বংশক্রম অনুসারে শের শাহের সপ্তম অধস্তন পুরুষ ছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি ছিলেন সহজাত নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব (চৌধুরী ও পারভেজ, ২০০০:১২-১৩)। তার পিতা কাজী ওয়াজেদ আলী ছিলেন একজন আইনজীবি এবং মাতার নাম ছিল সাইদুন্নেসা খানম। তাদের দুই কন্যা বদরুন্নেছা ও আফজালুন্নেছা এবং ফজলুল হক ছিলেন তাদের একমাত্র পুত্র সন্তান। নিম্নে শের শাহ থেকে এ. কে. ফজলুল হক পর্যন্ত বংশ লতিকা প্রদান করা হলো:

এ. কে. ফজলুল হকের বংশ অনুক্রম

শের শাহ (ভারত সম্রাট ১৫৩৮-১৫৪৫)

⇓

আগা বাকের খান (শের শাহের আত্মীয় এবং জেনারেল)

⇓

আমীর মিঞা (বাকের খানের জামাতা)

⇓

শরীফুন্নেছা (আমীর মিঞার কন্যা)

⇓

ফাতিমা খাতুন (শরীফুন্নেছার কন্যা)

⇓

কাজী আকরাম আলী (ফাতিমা খাতুনের পুত্র)

⇓

কাজী ওয়াজেদ আলী (কাজী আকরাম আলীর পুত্র)

⇓

এ. কে. ফজলুল হক (কাজী ওয়াজেদ আলীর পুত্র)

সূত্রঃ Muhammad Sanaullah, *A. K. Fazlul Huq: Portrait of a leader*, Homeland Press and Publication, Dhaka, 1995, p. 53.

এ. কে. ফজলুল হক পারিবারিকভাবে উচ্চ শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত রক্ত ধারার অধিকারী ছিলেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে এবং কলকাতা

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি গণিত, রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যা এই তিন বিষয়ে ১৮৯৪ সালে স্নাতক (সম্মান) এবং গণিতে মাষ্টার ডিগ্রি লাভ করেন ১৮৯৫ সালে। এরপর ১৮৯৭ সালে তিনি আইন শাস্ত্রে ডিগ্রি অর্জন করেন (হায়দার, ও মাহমুদ, ১৯৯৯:৭০-১১৫)। ফজলুল হকের বিচিত্র কর্মময় জীবন ছিল। পত্রিকা সম্পাদনা, আইন ব্যবসা, অংক শাস্ত্রে কলেজে অধ্যাপনা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সমবায় সমিতির সহকারি রেজিস্ট্রার পদে সরকারি চাকরি ইত্যাদি তার প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতা (রশিদ, ২০১১:১৪৯-১৫০)। ১৯১১ সালে তিনি সরকারি চাকরি থেকে ইস্তেফা দিয়ে সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন বেছে নেন। শুরু হয় তার অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী বিস্তৃত ও ঘটনা বহুল রাজনৈতিক জীবন।

বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে তিনি প্রথমে (১৯১৩-১৯৪৭) বঙ্গীয় আইনসভা, পরে পাকিস্তান গণপরিষদ (১৯৪৭-১৯৫৫) ও জাতীয় আইন পরিষদের (১৯৫৬-১৯৫৮) নির্বাচিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন, বাংলার শিক্ষামন্ত্রী (১৯২৪), কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মুসলিম মেয়র (১৯৩৫), দু'দফায় ক্রমাগত ছ'বছর যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৩৭-১৯৪৩), পূর্ব পাকিস্তানের এডভোকেট জেনারেল (১৯৪৭-১৯৫২), পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৪), পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী (১৯৫৫), পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর (১৯৫৬-১৯৫৮) ইত্যাদি পদসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (Razu, 2016)। এছাড়া ১৯৪০ সালে তিনি ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ফজলুল হকের বহুল আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকার মধ্যে অন্যতম হলো জোটবদ্ধভাবে যুক্ত বাংলায় সরকার গঠন (১৯৩৭-১৯৪৩) ও পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার (১৯৫৪) গঠন।

জোটবদ্ধ রাজনীতি ও শেরে বাংলা

রাজনীতি একটি চলমান প্রক্রিয়া। আর এই প্রক্রিয়ার বাস্তবতা হচ্ছে জোট রাজনীতি (Hans, 1969:175)। এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ব্রিটিশ সরকার বিরোধী বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচি থেকেই রাজনৈতিক জোটের আবির্ভাব ঘটে (আক্তার, ২০১৭:২৮৯-২৯০)। রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যজোট গঠনের লক্ষ্যে বাংলার কংগ্রেসিদের আহবানে সাড়া দিয়ে এ. কে. ফজলুল হক ও তার অনুসারিরা হিন্দু-মুসলিম সংযুক্ত মোর্চার একটি নয়া রাজনৈতিক নীতিকৌশলের প্রস্তাব রাখেন–সাংবিধানিক অগ্রগতির উদ্দেশ্যে জাতীয় প্রচেষ্টা এগিয়ে নেওয়ার নিমিত্তে (Broomfield, 1968:113-114)। ফজলুল হকের উদ্যোগ ও সমন্বয় সাধনে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নেতাগণ ১৯১৬ সালে ঐতিহাসিক 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' সম্পাদন করেন। এই চুক্তিটি ছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তথা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার এক অনন্য পদক্ষেপ (হাবীবুল্লাহ্, ২০১৯:৪১-৪৩)। শেরে বাংলার সহায়তায় এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় উভয় সম্প্রদায়ের প্রগতিশীল নেতৃবর্গের নিকট তার ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা বেড়ে যায়।

১৯১৬ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি একাধারে মুসলিম লীগের সভাপতি ও কংগ্রেসের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন (মজিদ, ২০২৩) যা ছিল একটি বিরল কৃতিত্ব। কিন্তু তার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা সার্বক্ষণিকভাবে বাংলার দরিদ্র কৃষক সমাজকে ঘিরে আবর্তিত হতো। আর সেকারণেই তিনি কংগ্রেস কিংবা মুসলিম লীগের রাজনীতি ছেড়ে ১৯২৯ সালে গঠন করেন নিখিল বাংলা প্রজা সমিতি। যা পরবর্তীতে কৃষক-

প্রজা পার্টি এবং এরও বেশ পরে এটিকে আবার পরিবর্তন করেছিলেন কৃষক-শ্রমিক পার্টি হিসেবে (দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২০১৮)। এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন অত্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ একজন রাজনীতিক। তিনি হিন্দু-মুসলিম-নির্বিশেষে কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের অধিকার আদায় ও স্বার্থ উদ্ধারের রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে তিনি খুব অল্পসময়েই একজন অসাম্প্রদায়িক নেতা হিসেবে নিজেকে গ্রহনযোগ্য করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যার প্রতিফলন ঘটে কোয়ালিশন সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ভোটাধিকার ও আইনসভার সদস্য সংখ্যার যথেষ্ট বৃদ্ধি এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রর্বতন প্রাদেশিক পর্যায়ে সরকার গঠনের বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। এ সময় থেকে বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম নেতৃত্বেও উত্থান ঘটে। ব্রিটিশ শাসনের শেষ দশকে (১৯৩৭-৪৭) বাংলা প্রদেশের প্রাদেশিক আইন পরিষদের ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করায় কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা এ. কে. ফজলুল হক সর্বপ্রথম (১৯৩৭-৪১) এবং দ্বিতীয় (১৯৪১-৪৩) কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। এর ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান শাসনামলে ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচনে এ. কে. ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে রাজনীতি জোটের সূত্রপাত হয় (আক্তার, ২০২১:৩৫৯-৩৬১)। নিম্নে প্রথমে এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে উপমহাদেশে কোয়ালিশন সরকার ও এর মূল্যায়ন এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান শাসনামলে রাজনীতিতে শেরে বাংলার প্রত্যাবর্তন ও ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন এবং এই সরকারের মূল্যায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্রেক্ষাপট

১৯৩৫ সালে ভারতে এক নতুন ভারতীয় আইন প্রতিষ্ঠা করা হয়। যা ভারত শাসন আইন নামে অধিক পরিচিত। এ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো–(১) ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র হবে এবং (২) প্রদেশগুলির প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন থাকবে (ইসলাম, ২০০৭:২১১-২২৬)। এ আইনে আরও বলা হয় যে, ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকর হবে। এছাড়া এ আইনের অধীনে ভোটাধিকার ও আইনসভার সদস্যসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯১৯ সালে যেখানে শতকরা মাত্র ৩ ভাগ লোক ভোটার ছিল, সেখানে ১৯৩৫ সালে তা শতকরা ১৪ ভাগে উন্নীত হয়। আইনসভার সদস্যসংখ্যাও ১৩৯ জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫০ জনে দাঁড়ায়। ফলে এদেশীয়দের কাছে প্রাদেশিক পর্যায়ে সরকার গঠনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৩৭ সালের ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় অবিভক্ত বাংলা প্রদেশেও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে প্রধানত ৩টি দল–কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি অংশগ্রহণ করে। এ নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টির প্রধান হিসেবে এ. কে. ফজলুল হক অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৪ দফা কর্মসূচি নিয়ে নির্বাচনী প্রচারনা শুরু করেন। তার ইশতেহারের প্রধান বিষয় ছিল বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ। খাজনার হার কমানো, নগর ও সেলামী রহিতকরণ, ঋণ সালিসি বোর্ড গঠন, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, বাংলায় পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল রাজবন্দির মুক্তি ইত্যাদি (আহমদ, ১৯৮১:১১১)। কৃষক প্রজা পার্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্লোগান ছিল 'লাঙল যার জমি তার, ঘাম যার দাম তার' (জাহান, ২০২১)।

ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১)

১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের ১১টি প্রদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অংশগ্রহণ করে। এছাড়া স্বতন্ত্র মুসলমান, স্বতন্ত্র হিন্দু, স্বতন্ত্র তফসিলি সম্প্রদায়, ইউরোপীয় ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে (মোমেন, ২০২১)। এ নির্বাচনে বাংলায় মুসলমানদের জন্য বরাদ্দকৃত ১১৭টি আসনের মধ্যে ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি ৩৫, মুসলিম লীগ ৩৯ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৪১ আসন লাভ করে। বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের জন্য বরাদ্দকৃত আসনে মুসলিম লীগ ৪ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২টি লাভ করেন। ফলে, মুসলিম লীগ ও স্বতন্ত্র সদস্যদের সর্বমোট আসন সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৯ ও ৪৩ (Rashid, 1987:80)। এ নির্বাচনে কোনো দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করায় কোয়ালিশন সরকার গঠন অনিবার্য হয়ে উঠে। সম্ভবত এটাই উপমহাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কোয়ালিশন সরকার গঠনের অভিজ্ঞতা।

সারণি–১

১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের ফলাফল (এলাকাভিত্তিক আসন)

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	ভোট প্রাপ্তি (প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার)
কৃষক-প্রজা পার্টি	৭৫	৩৬	৩১.৫১
মুসলিম লীগ	৭৮	৩৫	২৭.১০
ত্রিপুরা কৃষক সমিতি	১০	০৫	৩.৭৭
স্বতন্ত্র	৯৩	৪১	৩৭.৬২
সর্বমোট	২৫৬	১১৭	১০০

সূত্রঃ Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh Bengal Muslim League & Muslim Politics 1936-1947*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1987, p. 80.

বাংলার গভর্নর শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথমে কংগ্রেসের বাংলার সভাপতি শরৎ বসুকে আহবান জানিয়ে সাড়া না পেয়ে ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান (ইসলাম, ২০০৩:৩৮০-৪০৭)। ফজলুল হক বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে বঙ্গীয় আইনসভায় মুসলমান সদস্যরা যেন ঐক্যবদ্ধ থাকে, সেজন্য মুসলমান জনমতের প্রচ- চাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রথমে কংগ্রেসের সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। কারণ কংগ্রেসের নেতাগণ শেরে বাংলার জাতীয়তাবাদী ও উদার মানসিকতাকে পছন্দ করলেও তার জমিদারি প্রথা অবসানের দাবিকে মেনে নিতে পারেননি। ফলে শেরে বাংলা মুসলিম লীগ ও কয়েকটি সংখ্যালঘু এবং তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত গোষ্ঠীকে নিয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট প্রজা-লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন (চ্যাটার্জী, ২০০২:১৪)। নিম্নে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা উপস্থাপন করা হলো:

সারণি–২

প্রজা-লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা (১৯৩৭)

নাম	দল	দপ্তর	আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট
এ. কে. ফজলুল হক	কেপিপি	মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	আইনজীবি
স্যার খাজা নাজিমউদ্দিন	মুসলিম লীগ	স্বরাষ্ট্র	জমিদার
খাজা হাবিবুল্লাহ	মুসলিম লীগ	কৃষি ও শিল্প	জমিদার
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী	মুসলিম লীগ	বাণিজ্য ও শ্রম	আইনজীবি
সৈয়দ নওশের আলী	কেপিপি	জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন	আইনজীবি
নবাব মোশাররফ হোসেন	মুসলিম লীগ	আইন ও বিচার	জমিদার
নলিনী রঞ্জন সরকার	স্বতন্ত্র হিন্দু	অর্থ	পুঁজিপতি
স্যার বি.পি. সিংহ রায়	স্বতন্ত্র হিন্দু	রাজস্ব	জমিদার
প্রসন্ন দেব রায়কুত	স্বতন্ত্র হিন্দু	শুল্ক ও বন	জমিদার
মুকুন্দবিহারী মল্লিক	স্বতন্ত্র হিন্দু	সমবায়, ঋণ ও পল্লী দারিদ্র্য	আইনজীবি
মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র নন্দী	স্বতন্ত্র হিন্দু	যোগাযোগ ও পূর্ত	জমিদার

সূত্রঃ ড. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশঃ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১১১-১১২।

ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা (১৯৪১-১৯৪৩)

ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা ছিল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে দ্বিতীয় কোয়ালিশন সরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে গঠিত (২১ জুলাই ১৯৪১) ভাইসরয়ের 'ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিল' (জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিল) এ যোগদান এবং সরকারি যুদ্ধ প্রচেষ্ঠার সঙ্গে সহযোগিতা দান প্রশ্নে জিন্নাহর সঙ্গে ফজলুল হকের তীব্র মতপার্থক্য দেখা দেয়। ফলে জিন্নাহর সঙ্গে ফজলুল হকের রাজনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। জিন্নাহর মতের বিরুদ্ধে ফজলুল হক ইন্ডিয়ান ডিফেন্স কাউন্সিলে যোগদান করলে ১৯৪১ সালের ১০ ডিসেম্বর তাকে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং একই সাথে তার মন্ত্রিসভার মুসলিম লীগ সদস্যরা একযোগে পদত্যাগ করেন (হোসেন, ২০০৮:১৫৮)। ফলে ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। হক মন্ত্রিসভার পতনের পর খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা চলছিলো। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা গঠনের বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করে। এছাড়া মুসলিম লীগের সংসদীয় দলের নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দলের কারণে খাজা হাবিবুল্লাহ ও তার ৮ জন অনুসারী মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন এবং ফজলুল হকের সঙ্গে যোগ দেন। ফলে ফজলুল হকের দল আবার সংখ্যাগরিষ্ঠা লাভ করে । গভর্নর হার্বাট পুনরায় ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানাতে বাধ্য হন। ফজলুল হক একই সময় মন্ত্রিসভা গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দলকে অন্তর্ভুক্ত করে 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি' গঠন করেন (রহিম, ২০০১:২৪৭)। এর অন্তর্ভুক্ত দল বা

গ্রুপ গুলো ছিলো: ১. কংগ্রেস; ২. ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেস; ৩. হিন্দু মহাসভা; ৪. কৃষক-প্রজা পার্টি (শামসুদ্দিন); ৫. ইন্ডিপেডেন্ট তফসিলি হিন্দু এবং ৬. কৃষক-প্রজা পার্টি (হক)।

ফজলুল হকের নতুন মন্ত্রিসভা পাঁচমিশেলী হলেও মন্ত্রিসভাটি তার নাম (হক) এবং হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর নাম যুক্ত করে 'হক-শ্যামা' মন্ত্রিসভা নামে পরিচিত (আলী, ১৯৮৮:১৫৮-১৬১)। ফজলুল হক তার দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা দুই পর্যায়ে গঠন করেন। প্রথম পর্যায় ১১ ডিসেম্বর এবং দ্বিতীয় পর্যায় ১৮ ডিসেম্বরে। দুই পর্যায়ে মন্ত্রিসভা গঠন করার কারণ ছিলো মুখ্যত নবগঠিত প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির নেতা শরৎ বসুর মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণের দিন ভারত রক্ষা আইনে গ্রেফতার হওয়া। ভবিষ্যতে তার জন্য মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রাখার লক্ষ্যে এভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। সরকারের ১১টি দপ্তর থাকলেও, ফজলুল হক ৮ জন মন্ত্রী এবং ১ জন পার্লামেন্টারি নিয়ে এই মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ফজলুল হকের নতুন মন্ত্রিসভায় তিনি ছাড়াও চারজন হিন্দু ও চার জন মুসলিম সদস্য ছিলেন। তারা হলেন খাজা হাবিবুল্লাহ (মুসলিম লীগ ত্যাগকারী), খান বাহাদুর আবদুল করিম (স্বতন্ত্র), খান বাহাদুর হাশেম আলী খান (কৃষক প্রজা পার্টি), শামসুদ্দিন আহমদ (কৃষক প্রজা পার্টির এক অংশের নেতা), শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী (হিন্দু মহাসভা), সন্তোষ কুমার বসু (ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেস), প্রমথনাথ ব্যানার্জী (ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেস) এবং উপেন্দ্রনাথ বর্মন (তফসিলী হিন্দু)। ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার সদস্য তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

সারণি -৩

ফজলুল হকের প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা (১৯৪১-১৯৪৩)

নাম	দল	দপ্তর
এ. কে ফজলুল হক	কেপিপি	মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র ও প্রচার
খাজা হাবিবুল্লাহ বাহাদুর	মুসলিম লীগ (ত্যাগকারী)	কৃষি ও শিল্প
খান বাহাদুর আবদুল করিম	স্বতন্ত্র	শিক্ষা ও বাণিজ্য
খান বাহাদুর হাশেম আলী খান	কেপিপি	সমবায়,ঋণ ও গ্রামীণ ঋণ গ্রস্ততা
শামসুদ্দিন আহমেদ	কেপিপি (শামসুদ্দিন)	যোগাযোগ ও পূর্ত
শ্যামাপ্রসাদ মুখ্যার্জি	হিন্দু মহাসভা	অর্থ
সন্তোষ কুমার বসু	ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেস	জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন
প্রমথ নাথ ব্যানার্জি	ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেস	রাজস্ব, আইন ও বিচার
উপেন্দ্র নাথ বর্মণ	তফসিলি হিন্দু	বন ও আবগারি

সূত্র: এনায়েতুর রহিম, *বাংলায় স্বশাসন (১৯৩৭-১৯৪৩)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২৪৭।

ফজলুল হকের কোয়ালিশন সরকারের মূল্যায়ন

ফজলুল হকের দু'পর্যায়ের কোয়ালিশন সরকার ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রথম মন্ত্রিসভায় বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের ফলে আদর্শগত অবস্থান ছিল ভিন্ন। ফলে প্রথম থেকেই মন্ত্রিসভার সদস্যদের

মধ্যে প্রজাস্বত্ব ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কার, প্রজাস্বত্ব অধিকার, শিক্ষানীতি, গ্রামীণ ঋণ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বিশেষ করে, প্রজা-পার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যে আদর্শগত ও স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ছিল প্রবল। উদাহরণস্বরূপ: প্রজা-পার্টি ভূমি সংস্কারের পক্ষে ছিল, কারণ এ দলটি ছিল অসাম্প্রদায়িক এবং সাধারণ জনগণের। অপরদিকে, মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক ও উচ্চ শ্রেনীর দল হওয়ায় তা বরাবরই ভূমি সংস্কারের বিপক্ষে ছিল। এছাড়া নির্বাচনী কর্মসূচিতে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদের প্রতিশ্রুতি দিলেও ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভায় ১১ জন সদস্যদের মধ্যে ৬ জনই ছিলেন জমিদার (আক্তার, ২০১২:৬৩-৬৪)। সে কারণে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১৯৩৭ সালের নির্বাচন ও ফজলুল হকের প্রথম কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন ছিল বিশ শতকে বাংলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার একটি । এই কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় যে সকল আইন প্রণেতারা নির্বাচিত হয়েছিলেন তারা ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তাদের পদে বহাল ছিলেন এবং বহুলাংশে প্রদেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। কোয়ালিশন সরকার গঠন ও দীর্ঘ মেয়াদী সরকার পরিচালনায় থাকায় শাসকবর্গের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা যেমন হয় তেমনি সমঝোতা এবং সংহতির শিক্ষাও তারা লাভ করেন। এছাড়া ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের মাধ্যমেই জনসংখ্যার এক বৃহদাংশ সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ ভোটদানের অধিকার পায়, যা ভারতবর্ষে সাধারণ জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক ধারার সূচনা করে। এ নির্বাচনে লক্ষণীয় বিষয় হলো, দল বা রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে ভোট প্রদান করা হয়নি, তার বদলে প্রার্থীর ব্যক্তিগত দোষ-গুণ এবং যে প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিলেন, সেই বিষয়সমূহ মুখ্য ছিল। নির্বাচনে এভাবে দলীয় অবস্থান, কর্মসূচি ভোটদাতাদের সিদ্ধান্তকে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিলো। এছাড়া মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রি ছাড়া ১০ জনের মধ্যে ৫ জন হিন্দু নিযুক্তির মাধ্যমে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের দিকটিও ফজলুল হকের প্রথম কোয়ালিশন সরকারে প্রাধান্য পেয়েছে। যা ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক চেতনার নতুন ধারা সৃষ্টি করে।

অপর দিকে, ফজলুল হক তার প্রথম কোয়ালিশন সরকার কর্তৃক সূচিত ধারা অব্যাহত রাখতে পারেননি তার দ্বিতীয় কোয়ালিশন সরকার ব্যবস্থায়। ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ধারা পুনরায় বাংলার রাজনীতিতে বিন্যাস্ত করার চিন্তা করেন। কিন্তু, মুসলিম লীগের অনবরত বিরোধীতা এবং ফজলুল হকের কিছু ভুল সিদ্ধান্তের কারণে তিনি সফলতার মুখ দেখতে পাননি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ফজলুল হকের দ্বিতীয় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। তথাপি, ফজলুল হকের দ্বিতীয় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ক্ষেত্রে সামান্য হলেও তিনি সফল কারণ তার মন্ত্রিসভা যে ১ বছর ৩ মাস ১৪ দিন ক্ষমতায় ছিল সেই সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল।

পাকিস্তান শাসনামলে রাজনীতিতে শেরে বাংলার প্রত্যাবর্তন

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্তের পর এ. কে ফজলুল হক পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ফজলুল হক সমর্থন দেন। ১৯৫৩ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের সময় তার নেতৃত্বে কৃষক-প্রজা পার্টির কর্মীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে দলের নাম থেকে 'প্রজা' শব্দটি বাদ দিয়ে 'কৃষক-শ্রমিক পার্টি' গঠন করা হয়। আবদুল লতিফ বিশ্বাসকে সাধারণ সম্পাদক করে এই পার্টির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এ. কে ফজলুল হক।

পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব হতে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে ফজলুল হক-সমর্থিত গোষ্ঠী ও সোহরাওয়ার্দী-সমর্থিত গোষ্ঠীর মধ্যে মতভেদ চলে আসছিল; বিশেষত বাংলার রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে মতানৈক্য দেখা দেওয়ায় উভয় গোষ্ঠীই মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং মুসলিম লীগের দোর্দ- প্রতাপের বিরুদ্ধে এ. কে ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট নামে একটি নির্বাচনী জোট গঠিত হয় (Sayeed, 1967: 65)। এটাই ১৯৪৭ সালের পরে গঠিত এ দেশের প্রথম যুক্তফ্রন্ট। এর শরিক দলগুলো ছিলো: ১. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর আওয়ামী মুসলিম লীগ; ২. শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টি; ৩. মাওলানা আতাহার আলীর নিজাম-ই-ইসলাম এবং ৪. হাজী মোহাম্মদ দানেশের নেতৃত্বাধীন গণতন্ত্রী দল (রহমান, ১৯৮২:৩৭২)। মূলত যুক্তফ্রন্ট গঠন ছিল একটি নির্বাচনী কৌশল। এতে দু'টি বড় দল ও কতকগুলি ক্ষুদ্র দল তথা মধ্যপন্থী, গণতন্ত্রী, ইসলামী, বামপন্থী ইত্যাদি দল নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সত্যিকার অর্থে একটি ব্যাপকভিত্তিক জোটের রূপ লাভ করে। মুসলিম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানী আধিপত্য এ দু'য়ের বিরোধীতা ছিল জোটের সাধারণ ভিত্তি। পূর্ব বাংলার জন্য স্বায়ত্তশাসন অর্জনের অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা এবং মুসলিম লীগকে পরাজিত করার লক্ষ্যে এ দলসমূহ একতাবদ্ধ হয় (Callard, 1958:60)। যুক্তফ্রন্ট গঠনের কৌশল ছিল সময়োপযোগী ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয়।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

পাকিস্তানের সকল প্রাদেশিক আইন পরিষদে নির্বাচন হবার কথা ছিল ১৯৫১ সালে। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১৯৫১ সালেই প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন সম্পন্ন হয়। ১৯৫৩ সালে সিন্ধুতে জনগণের চাপে সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। কিন্তু, ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার নির্বাচনে হেরে যাবার ভয়ে ভীত হয়ে ১৯৫১ সালে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক আইন সভার যে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল তা করতে সাহস করেনি (আহাদ, ১৯৮২:৮৬-৮৮)। যাই হোক, অবশেষে ১৯৫৪ সালের ১১ মার্চ প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৬টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে (হোসেন ও করিম, ২০০৩:৪৬-৮৩)। তবে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় মুসলিম লীগ এবং মুসলিম লীগ বিরোধী শক্তির সঙ্গে।

১৯৫৪ সালের ১১ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের প্রাক্কালে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে যুক্তফ্রন্ট ২১-দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে (রায়, ১৯৯৪:৪২-৪৩)। যা সমাজের সর্বস্তরের ভোটারদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির পক্ষে জনমত গড়ে উঠে। সমগ্র পূর্ব বাংলা জুড়ে এক অভূতপূর্ব প্রাণ চাঞ্চল্যে সৃষ্টি হয়। যুক্তফ্রন্টের জনপ্রিয় স্লোগান ছিল– 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, হক-ভাসানী-শহীদ সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ, খুনী নূরুল আমিনের ফাঁসী চাই' প্রভৃতি (আহমেদ, ১৯৯৭:২২৩-২২৭)। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়ী হয়। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হলো:

সারণি -৪

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল (মুসলিম আসন)

দলের নাম	আসন লাভ	ভোট প্রাপ্তি (প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার)
যুক্তফ্রন্ট	২২৩	৬৪.০০
মুসলিম লীগ	৯*	২৭.০০
খেলাফতে রব্বানী	১	৯.০০
স্বতন্ত্র	৪	
মোট	২৩৭	১০০

*নির্বাচনের পর একজন স্বতন্ত্র সদস্য মুসলিম লীগে যোগ দেন ।

সূত্রঃ M. Rashiduzzaman, 'The Awami League in Political Development in Pakistan'. *Asian Survey*, Vol. X, No.7 (July 1970) এবং অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সারণিকৃত ।

সারণি -৫

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল (অমুসলিম আসন)

দল	আসন
কংগ্রেস	২৪
তফসিলী ফেডারেশন	২৭
যুক্তফ্রন্ট	১০
গণতান্ত্রিক দল	০৩
খ্রিষ্টান	০১
বৌদ্ধ	০২
কমিউনিষ্ট পার্টি	০৪
নির্দলীয়	০১
মোট	৭২

সূত্রঃ Keith Callard, *Pakistan: A Political Study,* George Allen & Union Ltd., 1957, p. 57.

উপরের বর্ণিত ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করতে সক্ষম হয় । অপরপক্ষে, যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসনে জয় লাভ করে । অবশিষ্ট ৫টি আসনের মধ্যে ৪টি লাভ করেন নির্দলীয় সদস্যগণ এবং ১টি লাভ করে খেলাফত রাব্বানী পার্টি । অপরদিকে, অমুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলোর মধ্যে কংগ্রেস লাভ করে

২৪টি, তফসিলী ফেডারেশন ২৭টি, যুক্তফ্রন্ট ১৩টি, খ্রিস্টান ১টি, বৌদ্ধ ২টি, কমিউনিস্ট পার্টি ৪টি এবং নির্দলীয় সদস্য ১টি আসন (ওদুদ, ২০১১:১৮১)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ভরাডুবি এবং যুক্তফ্রন্টের অভূতপূর্ব সাফল্য সূচিত হয়। এই নির্বাচন পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে প্রথাগত এলিটদের আধিপত্য অবসান করে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভূস্বামীদের হাত থেকে আইনজীবি, সাংবাদিক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী তথা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত তুলনামূলকভাবে তরুণ প্রজন্মের পেশাজীবী এলিটদের হাতে চলে যায়। নির্বাচনোত্তর যুক্তফ্রন্টের সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচনের পূর্বেই পূর্ব বাংলার গভর্নর চৌধুরী খালিকুজ্জামান ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান (Rashid, 1988:15-27)। ফ্রন্টের অন্যতম নেতা সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকায় এ. কে. ফজলুল হক প্রথমে ৪ সদস্য বিশিষ্ট এবং পরবর্তীতে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন করেন (সাঈদ, ১৯৯৬:৩৭)। ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার সদস্য তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

সারণি -৬

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা, ১৯৫৪

নাম	দপ্তর
এ. কে. ফজলুল হক	মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র ও সংস্থাপন
আবু হোসেন সরকার	অর্থ
আতাউর রহমান খান	বেসামরিক সরবরাহ
আবুল মনসুর আহমদ	জনস্বাস্থ্য
কফিল উদ্দিন চৌধুরী	আইন ও বিচার
সৈয়দ আজিজুল হক	শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন
আবদুস সালাম খান	শিল্প ও শ্রম
শেখ মুজিবুর রহমান	কৃষি, সমবায়, পল্লী উন্নয়ন
আবদুল লতিফ বিশ্বাস	রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার
আশরাফ আলী চৌধুরী	সড়ক ও গৃহ নির্মাণ
হাসিম উদ্দিন আহমেদ	বাণিজ্য ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন
রাজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী	স্বাস্থ্য
ইউসুফ আলী চৌধুরী	কৃষি, বন ও পাট
মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন	জমিদারী অধিগ্রহণ

সূত্র: ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-১৯৭১*, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, আগষ্ট, ২০০৮, পৃ. ২৪৭।

যুক্তফ্রন্টের মধ্যদিয়ে শেরে বাংলা পাকিস্তান শাসনামলেও একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে, তিনি বাংলায় এবং সম্প্রসারিত পাকিস্তানি রাজনীতিতে একটি রূপান্তরের যাত্রা শুরু করেন (Ahsan, 2018)। এ. কে. ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষও খুব খুশি হয়েছিল। তিনি কলকাতা সফরে আমন্ত্রিত হন। ফজলুল হক ৩০ এপ্রিল সরকারি সফরে কলকাতা যান এবং সেখানে বিভিন্ন সংবর্ধনা সভায় যেসব ভাষণ দেন তার মূল কথা ছিল–'রাজনৈতিক কারণে বাংলা দ্বিখন্ডিত হয়ে থাকলেও বাঙালির শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বাঙালিত্বের যে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে তা দুই বাংলায়ই বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও বর্তমান থাকবে (হেলাল, ১৯৮৫: ৪৭-৪৮)।' ফজলুল হকের এসব বক্তব্যে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন অপপ্রচার করতে থাকেন এবং তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনে। ১৯৫৪ সালের ৩০ মে শেরে বাংলার নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দিয়ে ৯২(ক) ধারায় গভর্নরের শাসন জারি করেন। এভাবে মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার অবসান ঘটে। এছাড়া বাংলা ও বাঙালির উন্নতির জন্য শেরে বাংলা পরবর্তীতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পরে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদের দায়িত্ব পালন করেন (বিশ্বাস, ২০১৭)।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের মূল্যায়ন

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই নির্বাচনের মধ্যদিয়ে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন মুসলিম লীগের তথা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ বা জোটবদ্ধভাবে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে ব্যালটের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর মাধ্যমেই বাংলার রাজনৈতিক ঐক্য পরিপূর্ণতা লাভ করে (আলম, ২০২৩)। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় এ অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা ও তাদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি প্রমাণিত হয় এবং বাঙালি জাতির ঐক্যবোধকে আরো প্রগাঢ় করে তোলে যা পরবর্তীতে জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক দ্বি-জাতিতত্ত্ব থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের দিকে রাজনৈতিক গতিধারার দিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তবে মন্ত্রীত্ব নিয়ে শরিকদের মধ্যে কোন্দল ছিল এই জোটের একটা বড় দুর্বলতা (চৌধুরী, ২০০৭: ১৬৮-১৬৯)। ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, সমঝোতাহীনতা, মতানৈক্য, এবং বহুমুখি দলীয় কর্মসূচির কারণে যুক্তফ্রন্টের ঐক্যের ভাঙ্গন দেখা দেয়। এছাড়া আদমজী জুট মিলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, কলকাতায় ফজলুল হকের ভাষণ, কেন্দ্রের সঙ্গে প্রদেশের অসহযোগিতা ইত্যাদি এই সরকারকে ভেতর থেকে ভঙ্গুর করে ফেলেছিল। ফলে ৫৬ দিনের মাথায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে (উজ্জামান, ২০২২: ১৩২-১৩৯)। অল্প সময়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকলেও ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও সাধারণ ছুটি ঘোষণা, বায়ান্নর ভাষা শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ, পহেলা বৈশাখকে সরকারি ছুটি ঘোষণা, বর্ধমান হাউজকে বাংলা একাডেমিতে রূপান্তর প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল।

কোয়ালিশন সরকারের গুরুত্ব ও প্রভাব

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, আধুনিক প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিক ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে পাকিস্তান শাসনামলের এক শতাব্দীকালের একটি জীবন্ত ইতিহাস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম দিশারী (ভূঁইয়া,

২০১১: ২১২-২১৪)। তার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিজ্ঞানী প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেছেন, বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নির্ভর করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ওপর। ফজলুল হক এই ঐক্যের প্রতীক। ফজলুল হকের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খাঁটি বাঙালি। সেই সঙ্গে ফজলুল হকের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খাঁটি মুসলমান (রাজু, ২০২৩)। যা তার রাজনৈতিক কর্মকা-ের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। উপনিবেশিক শাসনের সীমাবদ্ধতা ও জটিলতার এবং পাকিস্তান শাসনামলে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রমূলক অপরাজনীতির মধ্যেও শেরে বাংলা রাজনীতির নতুন ধারার সূচনা করেছিলেন। একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে শেরে বাংলা দ্বন্দ্ব ও জটিলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না, যাকে উপনিবেশিকতার উচ্চ যুগে তিনি যে জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন তার প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করতে হবে (Dey, 2023)।

একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন হিন্দু-মুসলমান মিলনের অগ্রদূত। ব্রিটিশ সরকার যেখানে উপমহাদেশে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রবর্তন করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে উৎসাহিত করেছিল, সেখানে শেরে বাংলা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি নিজেকে প্রথমে বাঙালি, তারপর মুসলমান বলে গর্ববোধ করতেন। বাংলায় সর্বপ্রথম অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা করেন শেরে বাংলা। তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য স্বজাতিকে ব্যবহার না করে সর্বদা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে বাংলার অনগ্রসর মুসলমান সমাজের উন্নতির চেষ্টা করেছেন। যা তার কোয়ালিশন বা জোট রাজনীতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

১৯৩৭ সালের নির্বাচন এবং এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রথম (১৯৩৭-১৯৪১) এবং দ্বিতীয় (১৯৪১-১৯৪৩) কোয়ালিশন সরকার গঠনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম। কারণ, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের মাধ্যমেই জনসংখ্যার এক বৃহদাংশ সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ ভোটদানের অধিকার পায়, যা ভারতবর্ষে সাধারণ জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক ধারার সূচনা করে। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে ১৯৩৭-১৯৪৩ সালের কোয়ালিশন সরকার গঠনের মধ্যদিয়ে তিনি অবিভক্ত বাংলার নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এ সময় তিনি বাংলার কৃষক, প্রজা ও শ্রমিক তথা নিম্ন শ্রেণীর অধঃপতিত মানুষের স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করে গেছেন। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পূর্ব বাংলায় ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার ঘটে। ফলে পূর্ব বাংলার মানুষের জীবনমানে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছিল। এছাড়া হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই নিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করায় হিন্দু মুসলমান ঐক্যের দিকটিও ফজলুল হকের কোয়ালিশন সরকারে প্রাধান্য পেয়েছিল। যা ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক চেতনার নতুন ধারা সৃষ্টি করে। তার সময়কালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল। যদি এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক কোয়ালিশন সরকার দীর্ঘস্থায়ী হতে পারত কিংবা রাজনৈতিক ঐক্য ধরে রাখতে পারত তাহলে হয়তো এ উপমহাদেশে রাজনীতি ভিন্নরূপ ধারণ করতো। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের একাংশের সাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনা, ব্রিটিশ শাসকদের বিভেদনীতি, ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের বৈরিতা এবং দুই সম্প্রদায়ের দুর্মোচ্য ভেদরেখার ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছিল (মামুন, ২০০৬: ২২-২৮)।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের মধ্যদিয়ে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এ সময় তিনি বাংলার কৃষক, প্রজা ও শ্রমিক তথা নিম্ন শ্রেণীর অধঃপতিত মানুষের স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করে গেছেন। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পূর্ব বাংলায় ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার ঘটে। ফলে এ অঞ্চলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। যাদের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্বের জন্ম হয়। পূর্ব বাংলায় নতুন ধারার রাজনীতির সূচনা ঘটে। এছাড়া জোটবদ্ধভাবে কাজ করার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা;

পরবর্তীতে বাঙালিদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার বিকাশ, গণতান্ত্রিক চেতনা এবং পরবর্তীতে একক জাতীয় রাষ্ট্র বাংলাদেশ গঠনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন এ. কে. ফজলুল হক। শেরে বাংলার কৃষক-প্রজা পার্টি ১৯৩৭ সালে ২২ দফার ভিত্তিতে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক নির্বাচন করেছিল। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফার ভিত্তিতে সেই মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচন করে। ২১ দফা ছিল তৎকালীন সাড়ে চার কোটি বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ। ২১ দফার মধ্যে নিহিত ছিল পূর্ববাংলার স্বাধীনতার দাবি। যুক্তফন্টের ২১ দফাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয় (সাঈদ, ১৯৯৫: ৮১)। শেরে বাংলার উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমত্বের দাবিই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার আলোকে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ৬ দফার ডাক দিয়েছিলেন। ৬ দফাই ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর এক দফায় পরিণত হয় ১৯৭১ সালে শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ এবং অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নির্দেশিত জোটবদ্ধ রাজনীতির পথেই স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্ষমতাসীন শাসকরা নিজেদের প্রয়োজনে এবং বিরোধী দল শাসক দলের বিরোধীতা কিংবা নির্বাচনের প্রয়োজনে জোট গঠন করেছে। আশির দশকে এরশাদ সরকার পতনে বিরোধী দল ও জোটসমূহ রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ৯০-পরবর্তী বাংলাদেশে বৃহৎ দলগুলো বিভিন্ন কারণে জোট গঠন করেছে এবং কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছে একাধিকবার। এর ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে দলীয় ব্যবস্থায় শৃংখলা কিয়াদাংশে ফিরে এসেছে, ছোট দলগুলো কথা বলার প্লাটফরম পেয়েছে এবং সরকারী সিদ্ধান্তে ন্যূনতম ভূমিকা রাখছে, বড় দলগুলোর মধ্যে সহনশীলতা ও পরমত সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেয়েছে, জোটের ভেতরে দলগুলো পারস্পরিক একে অপরের সমালোচনা করছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আশা করা যায়, জোটবদ্ধ রাজনীতি বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়ণে সহায়ক হবে।

Acknowledgement

This article was prepared with some assistance from the author's previous research on the related issue.

তথ্যনির্দেশ

Amanullah, October 26, 2017, "Sher-E-Bangla AK Fazlul Huq: The Braveheart of Bengal", *The Daily Star*, Dhaka.

Ahsan, Syed Badrul, April 26, 2018, "The Politics of Sher-e-Bangla Fazlul Huq", *Dhaka Tribune*, Dhaka.

Broomfield, J. H., 1968, *Elit Conflict in a Plural Society: Twentieth Century Bengal*, USA, pp. 113-114.

Callard, Keith, 1958, *Pakistan: A Political Study,* London: George Allen & Unwin Ltd., p. 60.

Dey, Amit, October 30, 2023, "Understanding the maverick politician, AK Fazlul Huq", *The Daily Star*, Dhaka.

Hans, J. Morgenthau, 1969, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Scientific Book Agency, Calcutta, p. 175.

Razu, A K Faiyazul Huq, May 7, 2016, "Sher-E-Bangla AK Fazlul Huq: A Pioneer of the Bengali Muslim Renaissance", *The Daily Star*, Dhaka.

Rashid, Harun-or, 1987, *The Foreshadowing of Bangladesh Bengal Muslim League & Muslim Politics 1936-1947*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, p. 80.

Rashid, Harun-or-, 1988, 'The Muslim League in East Bengal: The 1954 Elections & After', *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Vol. XXXlll, No.1, June, pp. 15-27.

Sanaullah, Muhammad, 1995, *A. K. Fazlul Huq: Portrait of a leader*, Homeland Press and Publication, Dhaka, pp. 52-53.

Sayeed, Khalid Bin, 1967, *The Political System of Pakistan,* Houghton Mifflin, Boston, p. 65.

আহমদ, আবুল মনসুর, ১৯৮১, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, পৃ. ১১১ ।

আহমেদ, সিরাজ উদ্‌দীন, জুন ১৯৯৭, *শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক*, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২৭৩-২৭৫ ।

আহাদ, অলি, ১৯৮২, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, খোশরোজ কিতাবমহল, ঢাকা, পৃ. ৮৬-৮৮ ।

আলী, সৈয়দ মকসুদ, ডিসেম্বর ১৯৮৮, *রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৫৮-১৬১ ।

আলম, জহুরুল, ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২৩, "যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বাঙালির বিজয় ও ভাষা সংগ্রাম", *দৈনিক বাংলা*, ঢাকা ।

আক্তার, তাসলিমা, ২০১২, *বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ণে জোটবদ্ধ রাজনীতির ভূমিকা ঃ একটি বিশ্লেষণ*, অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, পৃ. ৬৩-৬৪ ।

আক্তার, তাসলিমা, নভেম্বর ২০১৭, ''বাংলাদেশের রাজনৈতিক জোটের ঐতিহাসিক পটভূমি'', *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ জার্নাল*, ত্রিশতম খন্ড, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ২৮৯-২৯০ ।

আক্তার, তাসলিমা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, "জোট রাজনীতি: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ", তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ রাজনীতির ৫০ বছর*, শোভা প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩৫৯-৩৬১ ।

ইসলাম, সৈয়দ সিরাজুল, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, "বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশ" সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১: ১ম খ- রাজনৈতিক ইতিহাস*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ২১১-২২৬ ।

ইসলাম, সিরাজুল, (সম্পাদিত), ২০০৩, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১ম খ-*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ৩৮০-৪০৭ ।

উজ্জামান, মোহাম্মদ ফায়েজ, ফেব্রুয়ারি ২০২২, *যুক্তফ্রন্ট ও বঙ্গবন্ধু*, অনন্যা প্রকাশনা, ঢাকা, পৃ. ১৩২-১৩৯ ।

চ্যাটার্জী, জয়া, (অনুবাদ আবু জাফর), ২০০২, *বাঙলা ভাগ হল: হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এবং দেশ বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭*, ইউপিত্রল, ঢাকা, পৃ. ১৪ ।

চৌধুরী, আফসান, ২০০৭, *বাংলাদেশ ১৯৭১*, ১ম খ-, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১৬৮-১৬৯ ।

চৌধুরী, আ. ন. ম. মুনীর আহমদ, ও পারভেজ, মাহফুজ, ২০০০, *শতবর্ষের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ: রাজনীতি ও রানৈতিক ব্যক্তিত্ব*, গতিধারা প্রকাশনা, ঢাকা, পৃ. ১২-১৩ ।

জাহান, ড. মো: এমরান, মার্চ ১৭, ২০২৩, "শেরে বাংলা ও বঙ্গবন্ধু: রাজনৈতিক সম্পর্ক ও আদর্শ", *দৈনিক বণিক বার্তা*, ঢাকা ।

জাহান, ড. মো: এমরান, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২১, "এ কে ফজলুল হক ও কৃষক প্রজা পার্টি", *দৈনিক বণিক বার্তা*, ঢাকা।

দেখুন, *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, জানুয়ারি ১০, ২০১৮, "কৃষক–শ্রমিকের নেতা শেরে বাংলা", ঢাকা।

নির্জন, ফরিদুল ইসলাম, মার্চ ০২, ২০২৩, "ইতিহাসের ক্যানভাসে দুষ্প্রাপ্য দলিল", *দৈনিক সমকাল*, ঢাকা।

বিশ্বাস, ইলিয়াস উদ্দীন, এপ্রিল ২৭, ২০১৭, "শেরে বাংলার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন", *বাংলা ট্রিবিউন*, ঢাকা।

ভূঁইয়া, ড. মো. আব্দুল ওদুদ, ২০১১, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*, আজিজিয়া বুক ডিপো প্রকাশনা, ঢাকা, পৃ. ১৮১।

ভূঁইয়া, ড. মো. আব্দুল ওদুদ, নভেম্বর ২০১১, *ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক উন্নয়ন*, আনন্দ প্রকাশনা, ঢাকা, পৃ. ২১২-২১৪।

মাহফুজ, ইমরান, অক্টোবর ২৬, ২০২০, "বাংলার সামাজিক মুক্তি ও শেরে বাংলার প্রাসঙ্গিকতা", *দি ডেইলি ষ্টার বাংলা*, ঢাকা।

মজিদ, ড. মোহাম্মদ আবদুল, নভেম্বর ২৭, ২০২৩, "শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক", *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ঢাকা।

মোমেন, এম এ., সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২১, "১৯৩৭-এর নির্বাচন", *দৈনিক বণিক বার্তা*, ঢাকা।

মামুন, মুনতাসীর, জানুয়ারি, ২০০৬, *১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববাংলার প্রতিক্রিয়া*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ২২-২৮।

রহিম, এনায়েতুর, ২০০১, *বাংলায় স্বশাসন (১৯৩৭-১৯৪৩)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৪৭।

রশিদ, ড. হারুন-অর, জানুয়ারি ২০১১, *বাংলাদেশ: রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃ. ১৪৯-১৫০।

রহমান, হাসান হাফিজুর, (সম্পাদিত), নভেম্বর, ১৯৮২, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, প্রথম খ-, পটভূমি (১৯০৫ থেকে ১৯৫৮), ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৩৭২।

রায়, ভবেশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, *বঙ্গবন্ধুর জীবনকথা*, এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃ. ৪২-৪৩।

রাজু, এ কে ফাইয়াজুল হক, অক্টোবর ২৫ ২০২৩, "শেরে বাংলার অমর অবদান" *দৈনিক সমকাল*, ঢাকা।

সাঈদ, আবু আল, ১৯৯৫, *আওয়ামী লীগের শাসনকাল*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৮১।

সাঈদ, আবু আল, ১৯৯৬, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩৭।

হায়দার, আবুল কাসেম, ও মাহমুদ, সোহেল, অক্টোবর ১৯৯৯, *বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাস: নওয়াব সলীমুল্লাহ থেকে খালেদা জিয়া*, প্যানোরমা পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃ. ৭০-১১৫।

হাবীবুল্লাহ্, বি ডি., সেপ্টেম্বর ২০১৯, *শেরে বাংলা*, প্রথমা প্রকাশনা, ঢাকা, পৃ. ৪১-৪৩।

হোসেন, ড. আবু মো. দেলোয়ার, আগষ্ট, ২০০৮, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-১৯৭১*, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৫৮।

হোসেন, আবু মো: দেলোয়ার ও করিম, এস.এম. রেজাউল, ফেব্রুয়ারি ২০০৩, "১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার ও পূর্ববাংলায় এর প্রতিক্রিয়া", *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা-৮৬, পৃ. ৪৬-৮৩।

হেলাল, বশীর আল, অক্টোবর ১৯৮৫, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৪৭-৪৮।